সম্প্রতি কলকাতায় সৌন্দর্যায়ন কর্মসূচি এবং ঐতিহ্য বজায় রাখার কাজগুলি সবাইকে নাড়া দিয়েছে

# জলাভূমির ঐতিহ্যও বিশ্বের নজর কাড়তে পারে

আজ আন্তর্জাতিক জলাভূমি দিবস। সেই উপলক্ষে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে সারা দেশের আকর্ষণ কেন্দ্র করে তোলার জন্য কিছু প্রস্তাব। লিখছেন **ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ**

করবিস ইমেজেস

২ ফেব্রুয়ারি, জলাভূমি দিবস। অনেক অনেক ঘটনা নিয়ে দিবস পালন করার বেশ চলন হয়েছে। ভালো। হয়তো ভালো। কিন্তু রজনী কি দোষ করল? বিশেষত বিশ্ব চরাচর জুড়ে যে সব দিবস পালন হয় সেগুলিরও রজনী বা দিবস একই। এ দিকে যে দিবস ও দিকে সে রজনী। এ ছাড়া সূর্যালোক যদি সাফল্যের ইঙ্গিত হয় তবে জলাভূমির ক্ষেত্রে বিশ্ব জলাভূমি রজনী বলাটাই ভালো। বাস্তবসম্মত। জলাভূমি সংরক্ষণের কাজকর্মে এখনও ভোরের আলো দেখা দেয়নি। দিবস তো অনেক পরের কথা। আমাদের দেশের কথাই ধরুন না কেন। ৩৫ বছর আগে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারে দস্তখত করেছিল জলাভূমি বাঁচাতে কিন্তু আজও কোনও জলাভূমি নীতি নেই এ দেশে। একপ্রস্থ নিয়মাবলী যদিও বা বেরল তা এতই ভুলে ভরা আর যান্ত্রিক যে সেটি এখন রোগ সারাতে ছুটিতে গেছেন। একই অবস্থা অন্য অনেক দেশেই। তবু আমরা আশাতেই তো বুক বাঁধি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আশা করার মতো কাজও হচ্ছে।

আমি কলকাতার মানুষ। তাই অবশ্যই এই সুযোগে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি নিয়ে দু'এক কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। বিশেষত, আজ যখন রাজ্যে স্পষ্টত কলকাতায় সৌন্দর্যায়ন এবং ঐতিহ্য বজায় রাখার কাজগুলি সবাইকে নাড়া দিয়েছে। একটা নতুন বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। আমাদেরও আশা অনেক বেড়েছে।

কেন পূর্ব কলকাতা জগৎবিখ্যাত, কেন পূর্ব কলকাতা আমাদের দেশে সফল পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মের মুখ হতে পারে বা কেন আমরা এখানকার মানুষের বিজ্ঞানমনস্ক পুনর্ব্যবহারের জ্ঞান ভারতবর্ষের এক ঐতিহ্যমণ্ডিত আকর হিসেবে চিহ্নিত করব না— এ সব আলোচনা ঢের হয়েছে। যেটা হয়নি তা হল কী কী করলে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সারা দেশে সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডে সবাধিক আলোচিত, প্রশংসিত এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হবে, তার অন্তত গোড়ার কয়েকটি ধাপ স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া। এটাই প্রথম দিকের কাজ। এই ছোটো লেখাটিতে এমনই একটি সর্বনিম্ন সংখ্যার কর্মসূচি হাজির করা হল। এটা শেষ কথা নয়। তবে নিঃসন্দেহে সংরক্ষণের প্রথম দশটি ধাপ।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির একটি প্রাথমিক পরিচিতি না দিলে অনেক পাঠকের অসুবিধে হতে পারে তাই কয়েকটা কথা বলা। এই জলাভূমির নামকরণ অর্থাৎ পূর্ব কলকাতার জলাভূমি হিসেবে পরিচিত হয় ১৯৮৩ সালে। এর মানচিত্র তৈরি হয় ১৯৪৫-এ এবং তখন থেকেই পৃথিবীর নানান জায়গায় এই অসামান্য জলাভূমি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বস্তুত এই জলাভূমি একক ভাবেই অনন্য। পূর্বে জলাভূমির মাপ ১২৫০০ হেক্টর, তার মধ্যে ৪০০০ হেক্টর ময়লা জলে মাছের চাষ হয়। প্রায় লাখখানেক মানুষ এই চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। এই জলাশয়গুলি বস্তুত ন্যাচারাল বায়োলজিক্যাল রিঅ্যাকটর হিসেবে কাজ করে। তাতে ময়লা জল সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয়, অন্তত যে কোনও প্রচলিত পরিশোধনাগারে থেকে ভালো ভাবে হয়। ভেড়িতে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় অ্যালগি বা শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় যা আবার মাছের খাদ্য। গঙ্গা অ্যাকশন প্রকল্পে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই জলাভূমির ময়লা জলপরিশোধনের পারদর্শিতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়। কলকাতা শহরের জন্য কখনও কোনও প্রচলিত পরিশোধনাগার বসানোর চেষ্টা হয়নি। ময়লা জল ব্যবহারের এই অসাধারণ দৃষ্টান্ত মূলত কলকাতায় জলাভূমিকে জগদ্‌বিখ্যাত করে তুলেছে। ২০০২ সালে এই স্বীকৃতি আমরা পাই। কলকাতার জলাভূমি র‍্যামসার তালিকায় স্থান পায়। এত অবধি ভালোই ছিল কিন্তু শহরের ধারে এত বড়ো জলাভূমি থাকায় স্বভাবতই নির্মাণ লবির একটা প্রচণ্ড চাপ আছে। পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই এই চাপ আছে। তবু এখনও যা আছে আমরা স্বচ্ছন্দে স্বপ্ন দেখতে পারি যে এই জলাভূমি ভারতবর্ষের জলাভূমি কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে। দেশের গর্ব হবে এই ঐতিহ্য নিয়ে। কিন্তু কেমন করে হবে? এই উত্তর ভালো করে নেই। অন্তত আমাদের জানা নেই। এই উত্তর খোঁজার প্রাথমিক আলোচনাটা সেরে ফেলাই এ বার তার লেখার উদ্দেশ্য। বস্তুত ছড়ানো ছেটানো জলাভূমি দিবসের সংকীর্তন না গেয়ে বিশ্ব জলাভূমি দিবসকে মনে করে সরাসরি একটা সম্ভবপর কর্মকাণ্ডে যেতে পারা ২০১৬-তে একটা কাজের কাজ হবে বলে মনে হয়।

> প্রায় প্রত্যেক মৎসজীবীর মূল প্রশ্ন— ভেড়িগুলো থাকবে তো? না থাকা বে-আইনি তাই থাকার নিশ্চয়তা দিতে হবে। সোজা রাস্তা হল যত বেশি সংখ্যায় পারা যায় পাকাপোক্ত নিশানা দেওয়া যে এই জলাভূমিটি বোজানো বা বুজিয়ে বাড়ি করা বেআইনি।

যে কোনও কর্মকাণ্ডের গোড়ার কাজ হল সম্ভাব্য কাজগুলিকে বিভাগীয় দায়িত্বের মধ্যে নিয়ে গিয়ে করা। এতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধে হয়। আমাদের বর্তমান আলোচনার চারটি বিভাগীয় দায়িত্বের কথা বলা হবে। এই বিভাগগুলি হল— প্রশাসনিক তৎপরতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কর্মসূচি, জনকল্যাণসূচক কর্মসূচি, সৃজনধর্মী সংরক্ষণ কর্মসূচি।

সমস্ত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কাম্যও নয়। তবে প্রত্যেকের জন্য একটি ন্যূনতম কর্মসূচি হিসেবে নিশ্চয় বিচার করা যাবে।

আমরা প্রথমেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কী কী করা যায় সেই আলোচনা দিয়ে শুরু করতে পারি। তার কারণ প্রশাসনিক কাজকর্মগুলি সেরে না নিলে বা অন্তত জোরালো ভাবে শুরু না করলে বাকি কাজগুলো আর করা যাবে না। পুরোটা প্রচেষ্টাই হুড়মুড়িয়ে পড়বে। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হল ভেড়ি অঞ্চলে অনিশ্চয়তা দূর করা। অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি মৎসজীবীর মূল প্রশ্ন বা আতঙ্ক— ভেড়িগুলো থাকবে তো? না থাকাটা বে-আইনি তাই থাকার নিশ্চয়তা প্রকাশ্যেই দিতে হবে। একটা সোজা রাস্তা হল যত বেশি সংখ্যায় পারা যায় পাকাপোক্ত নিশানা দেওয়া যে এই জলাভূমিটি বোজানো বা বুজিয়ে বাড়ি করা বেআইনি। কোথাও সাইনপোস্ট নেই যে কলকাতার এই জলাভূমি একটি জগৎবিখ্যাত জলা— এটি একটি র‍্যামসার সাইট। বহু সাধারণ মানুষ দালালদের ধাপ্পায় ভুল বুঝে এখানে বাড়ি করার জন্য জমি কিনেছেন বা কিনছেন। কিন্তু ৩২টা মৌজার ১২৫০০ হেক্টর র‍্যামসার অঞ্চলে কোথাও ভেড়ি বা ধানক্ষেত বুজিয়ে বাড়ি করা যাবে না। করলে আইন ভাঙা হবে।

একই সাথে দ্বিতীয় প্রশাসনিক কাজ হবে, বসবাসের জন্য নয় এমন সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে। যে সব নির্মাণ হয়ে গেছে এবং তাতে মানুষ বসবাস করেন, ঠিকাদার তথা প্রোমোটারদের সমস্ত লভ্যাংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করে নিতে হবে। একই সাথে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত প্রধান এবং সদস্যদের উপরে দু'টি কাজে অংশ নিতে নির্দেশ দিতে হবে এবং ব্লকের খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

প্রশাসনিক পর্যায় একটি তুলনামূলক ভাবে সহজ কাজ হল, পড়ে থাকা ভেড়িগুলিতে মৎস চাষ শুরু করা। পঞ্চাশটারও বেশি এরকম বছরের পর বছর পড়ে আছে। জল নেই। ইচ্ছে করে শুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাল বুঝে বাড়ি তোলবার জন্য। কিছু কিছু শুকনো ভেড়িতে আবার ছোটো ছোটো দেওয়াল তুলে জমির ভাগাভাগি সেরে ফেলা হয়েছে। মৎসদপ্তরের এ ক্ষেত্রে সহজ সরল কাজ হল যাবতীয় শুকিয়ে ফেলা ভেড়িগুলি অধিগ্রহণ করে মাছচাষ শুরু করা নতুবা ওই ধরনের একটি অকেজো আইন তুলে ফেলা। আইনও আছে অথচ তার প্রয়োগে স্পষ্ট শিথিলতা প্রশাসনের দক্ষতা নিয়ে ভুল বার্তা পৌঁছে দেয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এই শিথিলতাগুলি ক্রমশ কমানোর চেষ্টা করার কথা বলা হচ্ছে।

এ কাজগুলি চলাকালীন আমরা দ্বিতীয় কর্মসমষ্টিতে যেতে পারি। দ্বিতীয়টি হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কর্মসূচি। এই কাজে মূলত জড়িত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ দপ্তর বা বোর্ড, সেচ দপ্তর ও কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান।

১) ময়লা জল সরবরাহ ও নিকাশী ব্যবস্থা চাষবাসের জন্য উপযুক্ত করা; ২) ময়লা জলের পরিমাণ ও গুণগত মান নিয়মিত সবাইকে জানানো; ৩) ধাপার ঐতিহাসিক সবজি চাষ এবং মাছ চাষ, যা কিনা পৃথিবীর বিরলতম পুনর্ব্যবহারের নজির তা আবার যথা শীঘ্র চালু করা।

তৃতীয় কর্মসমষ্টি হল এলাকার মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এবং এর মুখ্য দায়িত্বে থাকবেন সমাজ কল্যাণ, স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর। কোনও নতুন কাজ নয়। কেবল রাজ্যে যে ব্যবস্থাগুলি আছে সেটাই ভালো করে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজনগুলিও প্রচলিত। যেমন শিক্ষা, পানীয় জল। মৌলিক স্বাস্থ্যের জন্য যে যে প্রকল্পগুলি চলছে অথচ এই বত্রিশটি মৌজায় ঠিকমতো পৌঁছয়নি। তা ছাড়া যে সমস্ত অন্যরকম সরকারি প্রকল্প নতুন ভাবে চালু হয়েছে, সেগুলি যেন প্রত্যেক গ্রামবাসী তথা পরিবারের নাগালের মধ্যে পৌঁছতে পারে। কাউকে যেন ধরাধরি না করতে হয়।

এর পর আমরা যে কর্মসমষ্টির কথা আলোচনা করব যা হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই এলাকা পৃথিবীর নজরে পড়ে যাবে। দু'টি কাজ। প্রথমত, সংরক্ষণ ভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থা চালু করা এবং দ্বিতীয়টি হল একটি জলাভূমি কেন্দ্র স্থাপন করা।

কী করে সংরক্ষণ ভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থা চালু হবে? এটা মোটেই 'ইকো-টুরিজম'-এর প্রচলিত দাপাদাপি নয়। এলাকার ভিতরে ভিতরে সুন্দর পায়ে চলার রাস্তা করতে হবে। দু'পাশে খুব খেয়াল করে গাছ লাগাতে হবে। বনদপ্তরের থেকে যা হোক করে গাছ এনে লাগানো নয়। এলাকায় ভালো ঘাস নেই। খুব দরকার পথের ধারে ধারে সুন্দর ঘাসের চাদর বিছিয়ে দেওয়া। তারই মাঝে রংবেরঙের ফুলগাছের লুকোচুরি। পর্যটকরা চাইলে রাত কাটাতে পারেন। তার জন্য এলাকার মানুষকে তাঁদের ঘরের গায়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা বা নতুন একটা ঘর করার শিক্ষা দিতে হবে। ভারতের বেশ কিছু এলাকায় এই ব্যবস্থা ভালোই চলছে। তার পর ছোটো একটি পর্যটন কেন্দ্রও করতে হবে। বানতলায় হলে ভালো হয়। জায়গাও আছে। এই কেন্দ্রের দেওয়ালে নানান ছবি দিয়ে বোঝানো থাকব কেমন করে কী হয়। অন্তত তিনটি ভাষায় ছোটো পুস্তিকা থাকবে। ভাড়া করার জন্য সাইকেল থাকবে। চাইলে দূরবিনও। সবাই মিলে বসে ভাবলে আরও ভালো কাজ করা যাবে। অন্তত শুরুও করা যাবে।

এর পর জলাভূমি গবেষণা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের প্রধান কাজ হল এই দশ দফা কর্মসূচির প্রত্যেকটি কাজ নিয়ে বিচার করা। কোথায় কাজ আটকে যাচ্ছে তা বার করা। কী করে এগোবে তার হদিশ দেওয়া। আরও কী ভাবে ভালো করা যায় তা স্থির করা। যদি ক্ষমতা বাড়ে তবে দেশের অন্যান্য র‍্যামসার জলাভূমির উপর কাজ করা যেতে পারে। ভারতে এ ধরনের জলাভূমি গবেষণা কেন্দ্র কোথাও নেই।

যে কাজগুলির কথা বলা হল তা কিন্তু করে ফেলা যায়। খুব কম পরিশ্রমে কলকাতার একটি অসামান্য ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে তুলে দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া যাবে। সকলের শ্রদ্ধা আদায় করা যাবে।

**লেখক আইইউসিএন-এর বিশেষ উপদেষ্টা**